OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 466 - 473
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 466 - 473
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

লোকসংস্কৃতির ধারক-বাহক গাজন উৎসবটির বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

ড. রুষা ঘোষ দত্ত
স্টেট এডেড কলেজ টিচার (ক্যাটাগরি-১)
নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ (দিবা বিভাগ)
Email ID: dutta.rusha29@gmail.com
0009-0004-3842-2898

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Economic and social significance, globalization and cultural change, endangered folk traditions, contemporary relevance of Gajon.

Abstract
Gajon is a traditional folk festival celebrated in parts of Bangladesh and West Bengal, particularly in rural areas. This multi- dimensional festival is the festival of the low – born or Antyaja people. It is usually held at the end of the Bengali month of Chaitra, just before the Bengali New year (pohela Boishakh). The festival typically lasts for several days and involves a combination of devotional rituals, folk performances, and acts of penance. Participants, known as Gajon sannyasis or bhoktas, often dress in saffron clothes, fast, and take part in rituals such as dancing, singing, fire – walking, or even body-piercing, to show their devotion and seek blessings. Gajon is not just a religious event – it is a celebration of faith, tradition, and cultural unity in rural Bengali life. Given the socio- economic context of this agriculturally centered festival, its relevance in the current era of globalization, especially in the context of the development of the mechanical civilization, deserves special discussion.

Discussion

শিশুতোষ ছড়ায় গাজনের কথা আমরা যেভাবে পাই –

> “আমরা দুটি ভাই
> শিবের গাজন গাই
> ঠাকুমা গেছে গয়া কাশী
> ডুগডুগি বাজাই।”

অর্থাৎ, এই শিশুতোষ ছড়ার মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে গাজন উৎসব কেবল গ্রামীণ প্রাপ্ত বয়স্কদের অনুষ্ঠান নয়, বরং শিশুদের সংস্কৃতি ও কল্পনার জগতেও প্রবেশ করেছে। লোকসংস্কৃতির ধারক হিসেবে এ ছড়া গাজনের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে সহজ, খেলার ছলে, শিশুদের উপযোগী ভাষায় প্রকাশ করে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 466 - 473
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উৎসব মুখরিত বাংলাদেশ কিংবা পশ্চিমবঙ্গে গাজন উৎসবটি মূলতঃ প্রাক্-ফসলের উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল) এটি পালিত হয়। রূপবৈচিত্র্য নিরিখে এই উৎসবটির অঞ্চলভেদ অনুযায়ী তারতম্য আছে। তবে এই লৌকিক উৎসবটির মূল আকর্ষণ হল শিবের গাজন। বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম বিশারদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, 'গাজন' প্রকৃতপক্ষে আদিম সমাজের 'বর্ষাবোধন উৎসব'। গাজন উৎসবটিকে প্রকৃতপক্ষে শিবের বিবাহ উৎসব রূপেই সর্বত্র গ্রহণ করা হয়ে থাকে। 'গর্জন' (শিবের বিবাহে বরানুগামীদের উল্লাস এবং গর্জন) শব্দটিই এর মূল উৎস। 'গাঁ-জন' অর্থাৎ, গ্রাম-জনের উৎসব (১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটিতে শ্রীযুক্ত রামকমল সেন চড়কের গাজন সম্পর্কে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তাতে 'গাজন' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হিসাবে এই কথা তিনি বলেছিলেন)।[১] নৃত্যবিদ মণি বর্ধনের মতানুসারে,-

> "গাজন উৎসব জনগণের উৎসব। ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি আধিপত্য বর্জিত হাঁড়ি, বাগদি, ডোম, ধীবর, তাঁতি ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষেরাই 'গাজন' উৎসবটির প্রাণপুরুষরূপে সমাদৃত হয়ে থাকে।"[২]

সমগ্র পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই উৎসবটির বিভিন্নতা থাকলেও, শিবের গাজন লোকজীবনে, লোকভাবনায় এক অতি আপন এবং আদরণীয় উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নপ্রান্তে অনুষ্ঠিত চড়ক তথা গাজন উৎসব বহমান রাষ্ট্রীয়, আর্থ-সামাজিক জীবনের এক চলমানধারা। যে ধারা অসচ্ছল মানুষগুলির কাছে বেঁচে থাকার তাগিদে এবং নিজেদের পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখার এক আপ্রাণ প্রয়াসরূপে বিবেচিত। ধর্মগাজন, শিবেরগাজন, মনসার গাজন, শীতলার গাজন, রতনমালাদেবীর গাজন ইত্যাদি বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্য গাজন উৎসবটি অন্ত্যজ মানুষদের আবেগ-অনুভূতির এক যথার্থ বহিঃপ্রকাশ রূপে প্রতিভাত। এই আবেগ – অনুভূতির বশবর্তী হয়েই সেই সব মানুষেরা যেসব কৃচ্ছসাধন কিংবা কষ্টসাধ্যপ্রক্রিয়া অবলম্বন করে তা বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আইনবিরুদ্ধ। তবে এটাও স্বীকার্য যে, এইসব কৃচ্ছসাধন আইন করে বাতিল করা হলেও এখনো পর্যন্ত কৃচ্ছসাধনের নানান অনুষ্ঠান অবলীলায় পালন করা হয়ে থাকে। প্রাসঙ্গিকক্রমে লোকসংস্কৃতির গবেষক ডঃ মনোজিৎ অধিকারীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবেষক খুব কাছ থেকেই গাজন উৎসবটিকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, কৌতুহলি হয়ে তিনি কৃচ্ছসাধন প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে স্থানীয় মানুষেরা বলে 'আমরা এসব করবোই'। অতএব এটা খুব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, তারা তাদের মনের মধ্যে কিছু বদ্ধমূলধারণা ও বিশ্বাস থেকে এসব নানান কৃচ্ছসাধন পালন করে থাকে।[৩] গবেষক ডঃ মনোজিৎ অধিকারী তাঁর গবেষণায় এটা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, সাধারণভাবে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে, সন্তান উৎপাদন, শস্য উৎপাদন ইত্যাদির আশা-আকাঙ্খার কামনাবাসনা থেকেই দণ্ডিকাটা, ধূনাপোড়ানো, ঝাঁপ ইত্যাদি কৃচ্ছসাধনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আদিম জাদুবিশ্বাসও কার্যকারী করা হয়ে থাকে। শ্মশানে গিয়ে গাঁজাতে দম দেওয়া, ভাঁড়াল বা পচুই মদ পান করা, মদ-মাংসের অর্ঘ্য নিবেদন করা ইত্যাদি সবই গ্রাম্য লৌকিক রীতির চিরাচরিত এক বহমান ধারা।[৪]

বিভিন্ন গাজন উৎসবে পালিত বিভিন্ন লোকগীতি, লোকনৃত্য এবং লোকনাট্য প্রান্তিক মানুষদের জীবনচর্যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। লোকগীতি, নাট্য, নৃত্য এবং তার সাথে গাজনের মেলা গ্রামীণ জীবনের নিস্তরঙ্গ প্রবাহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহমান আনন্দ–উৎসবের বহিঃপ্রকাশ রূপে প্রতিভাত হয়। এই উৎসবে অনুষ্ঠিত লোকগানের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক রূপরেখা, কৃষিকাজ, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঘটনা – সবই প্রতিফলিত হয়।[৫] গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে ঢাকের গান (শিবের লৌকিক কাহিনী আশ্রিত নানা ছড়া আবৃত্তি করা হয়ে থাকে), নদীয়া জেলার সাজলে গান (একজন শিল্পী গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করে এবং অন্যজন গানের মাধ্যমে তার জবাব দেয়), মালদহের গম্ভীরা উৎসবকেন্দ্রিক সারিগান বা নৌকার গান – এসবই হল স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সাথে সামাজিক বার্তা সম্বলিত লোকগান।[৬] এই লোকগানগুলির সাথে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, সুন্দরবনের দুই চব্বিশ পরগণায় চৈত্র ও বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে শিবপূজার প্রাচীন ঐতিহ্য চড়ক বা ধর্মদেল–এর শিব-দুর্গাবিষয়ক 'বালাকি বা বালাগান', যা লোকায়ত সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ধর্মদেল তথা ধর্মমাস কিংবা বৈশাখ মাসে (এইমাসে একনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরা, অন্য সম্প্রদায়ের লোক মাছ- মাংস খায় না) সুন্দরবনের লোকেরা শিবপূজা বা চড়ক উৎসব পালন করে, যে উৎসবটি স্থানীয় ভাষায় 'ধর্মদেল' বলা হয়ে থাকে। সুন্দরবনের এই দেল বা চড়ক উৎসবের সঙ্গে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 466 - 473
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে লোকগানের প্রাচীন ঐতিহ্য 'বালাকি বা বালাগান'। শিবপূজায় শিব কিংবা দুর্গাবিষয়ক বালাকি গান পরিবেশনকারী বালাকিদার বাবালাদাররা চড়কের আদি-অকৃত্রিম এই বালাকি গানের ধারাকে আজও সুন্দরবন এলাকায় টিকিয়ে রেখেছে। এই সুন্দরবন এলাকায় একজন সাধারণ লেখক, গায়ক দ্বারা লিখিত এবং সুর প্রদত্ত বালাগানগুলির মাধ্যমে প্রাচীন পুঁথির শ্লোক ও নিয়ম অন্তর্ভুক্ত শিবের গাজন উৎসব পালন করা হয়।[৭]

ঐতিহ্যপূর্ণ গাজন উৎসবটির মাধ্যমে লোকগানের যে পরম্পরা বহমান আছে, লোকনৃত্যের ক্ষেত্রেও সেই পরম্পরাকেই বহমান হতে দেখা যায়। পুরুলিয়ার 'কাপ নাচ' কিংবা অন্যান্য স্থানে বর্ণিত 'সঙ' হল সামাজিক বিভিন্ন ঘটনার ব্যঙ্গাত্মক বহিঃপ্রকাশ। ছো নাচের প্রাথমিক উৎসস্বরূপ এই কাপ নাচ গাজন উৎসবের একটি প্রাচীন নৃত্য পরম্পরা। এছাড়া 'ঢাকি নাচ' এই উৎসবটির একটি মূল অঙ্গ। শিবকেন্দ্রিক উৎসব গাজনকে কেন্দ্র করে দেবী কালীর সাজসজ্জা পরিহিত 'কালী নাচ বা কালিকাপাতারিনাচ' উৎসবটিকে একটি অন্য মাত্রা দান করে। এই গাজন উৎসবটির অন্যতম আকর্ষণই হল গাজনের আচার নাচ 'ছো'। ছো নাচ অবশ্য বর্তমানে ভারতের পূর্বাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ এবং ছো অঞ্চলগুলোতে শিবগাজন উপলক্ষে ছো নাচ অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়াতে যুদ্ধকেন্দ্রিক এই ছো নৃত্য মূলতঃ লোকসংস্কৃতির বিশারদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য–এর ভাষায়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে নাচটি ক্রিয়াচারমূলক এবং জনপ্রিয়। 'মহিষাসুরবধ', 'তারকাসুরবধ', 'মহীরাবণবধ', 'লক্ষ্মণ দ্বারা মেঘনাদবধ', 'অভিমন্যুবধ' ইত্যাদি ক্রিয়াচারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত পুরুলিয়ার ছো নাচ দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় একটি লোকনৃত্যরূপে সর্বজনবিদিত।[৮]

গাজন উৎসবের বিভিন্ন স্থানে পালিত 'লোকনাট্য' এই উৎসবটির মাহাত্ম্যকে বহুগুণ বর্ধিত করে। 'বহুরূপী' লোকনাট্যটি গাজনের প্রাণ প্রতীকস্বরুপ। বহুরূপীর নানান রূপটানের আড়ালে খুঁজে পাওয়া যায় লোকায়ত শ্রমজীবী মানুষদের জীবন সংগ্রামের নির্মম চিত্র। সামাজিক শ্লেষ সৃষ্টিকারী বহুরূপীদের নাট্যকর্মের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয় চলমান জীবনের টুকরো টুকরো ছবি এবং যা তারা জনমানসের সামনে তুলে ধরে। বহুরূপী ব্যতীত 'সঙ' হল, নাটকীয় ভাব প্রকাশের সর্বাপেক্ষা বড় ও সার্বজনীন মাধ্যম। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের সময় সঙ দেখতে পাওয়া যায়। কৌতুকমিশ্রিত সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহকে 'সঙ' নাট্যধারার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। বিচিত্র রূপসজ্জায় সজ্জিত সঙদের অভিনয়মূলক আচরণের সাথে নৃত্য- গীতপ্রদর্শন এবং রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চাল-পয়সা সংগ্রহ করা গাজন উৎসবের একটি ঐতিহ্য-মণ্ডিত আদি পরম্পরা। কলকাতার কাঁসারিপাড়া, জেলেপাড়া, বেনেপাড়া, আহিরিটোলা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে নিয়মিত সঙ বের হত। বিভিন্ন সঙের দলগুলির মধ্যে 'জেলে পাড়ার সঙ' সবথেকে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বর্তমান সময়ে প্রায় অবলুপ্তির পথে যেতে বসেছে এই পারম্পরিক সঙ নাট্যধারাটি এবং এ কথা যেমন সত্য, তেমন বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আমতলার কৃপারামপুর ও কলকাতার জেলেপাড়ার সঙ এখনো পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটির অন্যতম আকর্ষণহল 'গাজনপালা'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডায়মন্ডহারবার, বাসন্তী, জয়নগর, ক্যানিং এবং হাওড়ার বেশ কিছু অঞ্চলে গাজনপালা বহুল প্রচলিত। পৌরাণিক বিষয়বস্তু সম্পর্কিত এই পালাগুলি গাজনের শৈল্পিক-নান্দনিক ধারাকেও প্রতীয়মান করে। তবে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক পালাও রচিত হচ্ছে এবং যেগুলি নান্দনিকতার সাথে সামাজিক বার্তাবহনকারী পালা হিসাবে কথা ও গানের মাধ্যমে সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। প্রকৃতঅর্থে, মানুষের মনের ক্ষোভ পালা বা গানের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়। মালদহ জেলার 'গম্ভীরা' তথা শিবের গাজনোৎসবটি হল, মুখোশ নৃত্যনাট্য এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক নৃত্য গীতাভিনয়। দিনাজপুরের 'গমীরা' ও মালদহের 'গম্ভিরা'-এই দুইই, গানের পরিমণ্ডলের সুত্র ধরে সমাজের ও মানুষের জীবনযাত্রার কথা তুলে ধরে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা তুলে ধরা হয়ে থাকে। গাজনের মত লৌকিক উৎসবটিকে এখনো পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে যে বিচিত্র লোকানুষ্ঠানটি সেটি হল, - 'বোলান গান'। ব্যঙ্গে-কৌতুকে, নৃত্য-গীতে, পাঁচালী অভিনয়ের মাধ্যমে বোলান হল এক আনন্দময় অনুষ্ঠান এবং অবশ্যই সাংস্কৃতিক স্ফুরণের এক অন্যতম মাধ্যম।[৯] সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের বর্ণনায় আই.সি.এস গুরুসদয় দত্ত তাঁর গ্রন্থে বোলান সম্পর্কে লিখেছেন, -

> "The word 'Bolan' means recitation, and the dance derives its name from the fact that one of the dancers chants or recites the story or ballad from a writing which he holds

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 466 - 473
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> in his hands... The distinguishing feature of the dance is that every dancer wears a flower wreath round his hand and a flower wreath hanging from his neck."[১০]

বোলানের যে সাংস্কৃতিক এবং নান্দনিক বর্ণনা লেখকের কলমের দ্বারা উন্মোচিত হয়েছে, সেই সূত্রে বলা যায় যে, বোলান অনুষ্ঠানটি যথার্থরূপে গাজনের একটি গীতময়, নৃত্যছন্দ আশ্রিত, অভিনয়িক সাংস্কৃতিক পারম্পরিক ধারা।

শিবের গাজন উপলক্ষে 'আলকাপ' তথা নৃত্য-গীতের প্রচলন অপর একটি সাংস্কৃতিক ধারা। প্রাচীন আলকাপে শিবের ছড়া গাওয়া একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে আজ তা হারিয়ে গেছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক এই নাট্য প্রহসনমূলক গানের আঙ্গিকে বিদ্রোহী কবি নজরুল অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করেছিলেন এবং যা বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে অনন্য সম্ভার হয়ে আছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও এই আলকাপের অসীম আকর্ষণে ঘর বিবাগী হয়েছিলেন। ১৯৫০-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি আলকাপ দলে বংশীবাদক ছিলেন। নান্দনিক সূক্ষ্মতার পরিবর্তে স্থূল, আঞ্চলিক ভাষাভিত্তিক এই পালাভিনয়কেন্দ্রিক গানে বিবর্তমান লোকনাট্যের ধারাবাহিক পরম্পরা বহমান। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যযে, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও তার সন্নিহিত জেলাসমূহে আলকাপ এক অতি জনপ্রিয় লোকনাট্য রূপে পরিচিত।[১১]

চৈত্রসংক্রান্তি পর্বে চড়ক-গাজন, বোলান, আলকাপ, বহুরূপী, সঙ, গম্ভীরা ইত্যাদি সমস্ত লোকায়ত উৎসবগুলি একসূত্রে বাঁধা। গাজনের মত লোকসংস্কৃতির ছত্রছায়ায় লোকগীতি, লোকনৃত্য, লোকনাট্য গ্রামীণ মানুষদের প্রবাহমান কঠোর জীবনসংগ্রামের মাঝে এক টুকরো স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের বাতাস বহন করে আনে। গাজনের মত লোকায়ত উৎসবটি যেমন ধর্মীয় পূজা-পার্বণের আঙ্গিক, তেমনি এটি অন্ত্যজ মানুষদের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক-সামাজিক আদান-প্রদানের স্বয়ংক্রিয় প্রতীয়মান আঙ্গিক। সেই অর্থে 'গাজনেরমেলা' সর্বোপরি সামাজিক-অর্থনৈতিক মেলবন্ধনের এক অনবদ্য প্রয়াসরূপে পরিগণিত। গাজনের মেলাগুলি মানুষের নিছক আমোদ-প্রমোদের স্বতঃস্ফূর্ত মাধ্যম নয়, এগুলির সামাজিক আবেদন অনস্বীকার্য। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মহেশতলা থানার অন্তর্গত চকমিরে চড়কমেলা, বারুইপুরে চড়কমেলা, বিষ্ণুপুর থানার জয়রামপুরে গাজনমেলা, বীরভূম জেলার নলহাটি থানার ধরমপুর গ্রামে চড়কের মেলা, বর্ধমান জেলার আসানসোল, কাজোরাগ্রাম, পলাশী, কাটোয়া ইত্যাদি অঞ্চলের শিবের গাজনমেলা পরম্পরাগত ভাবে বাঙালীর লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি আবেগ – অনুভূতিকে আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে।[১২]

এখন প্রশ্ন হল যে, বর্তমান বিশ্বায়নের কবলে পড়ে গাজনের মত একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকসংস্কৃতি কি বিস্মৃতির অতলগহ্বরে তলিয়ে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গেলে স্বাভাবিকভাবে উৎসবটির বর্তমান প্রাসঙ্গিকতার তাৎপর্য উত্থাপন করা আবশ্যক। গাজন উৎসবটির পশ্চাতে প্রকৃতঅর্থে কৃষক সমাজের একটি সনাতন বিশ্বাস কাজ করে থাকে। চৈত্র থেকে বর্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত যে সময় সূর্য প্রচণ্ড উত্তপ্ত থাকে, সেই সময় সূর্যের তেজ প্রশমন এবং বৃষ্টি লাভের আশায় অতীতে কোন এক সময় কৃষিজীবী সমাজ এই অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করেছিল।[১৩] এই বিশ্বাস থেকেই আদিবাসী-অন্ত্যজ মানুষেরা উৎসবটিকে কেন্দ্র করে অনাবিল আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা' নামক অনবদ্য সৃষ্টিতে তৎকালীন সময়ের গাজন তথা চড়কের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরেছিলেন। তিনি সে প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> "রাস্তায় লোকারণ্য, চারিদিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোন, সাপ, ছিপ ও বাঁশ ফুঁরে একেবারে মরিয়া হয়ে নাচতে নাচতে কালীঘাট থেকে আসচে। চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি-কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠল। এদিকে চড়কতলার টিনের ঘুরঘুরী, টিনের মুহুরী দেওয়া তল্ তা বাঁশের বাশি, হলদে রং করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তইরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির- করা হাঁড়ি বিক্রী কত্তে বসেচে। একজন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচতে নাচতে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে – মইয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশপানে চরকীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি

> ধরে কখন ছেড়ে, পা নেড়ে নেড়ে ঘুরতে লাগলো। কেবল 'দে পাক দে পাক' শব্দ, কারু সর্বনাশ, কারু পৌষমাস। একজনের পিঠ ফুঁড়ে ঘোরান হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেখ্ চেন।"[১৪]

কালীপ্রসন্ন সিংহের এই বর্ণনা অনুযায়ী, তৎকালীন কালীঘাট, হাজরা থেকে বুড়োবাজার (বর্তমান বড়ো বাজার), চিৎপুর যেদিকেই থাকুক না কেন, সন্ন্যাসীরা যার যার অঞ্চলের চড়কডাঙায় পৌঁছে যেত। আর তৎকালীন কলকাতার সবচেয়ে বড়ো অর্থাৎ ষোলো চড়কির চড়কগাছে চড়ক বাগবাজারে হত। এই বর্ণনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন সময়ে চড়ক তথা গাজনকে কেন্দ্র করে মানুষের উৎসাহ কম ছিল না। একটা বৃহৎ উৎসবের আমেজ এবং তার সাথে জিনিষপত্র ক্রয় – বিক্রয়ের মধ্যে দিয়ে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টিও স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়। অতএব গাজনের মত একটি লোক উৎসবের কেন্দ্রে নিছক আমোদ-প্রমোদের বিষয়টি কেবলমাত্র মুখ্য ছিল না, তার সাথে এই উৎসবটিকে কেন্দ্র করে একটি অর্থনৈতিক চালিকা শক্তিও আবর্তিত হত। আর এই অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির অপরিহার্য অঙ্গ হল চড়কের মেলা। তাই গাজনের মেলা কিংবা চড়কের মেলার গুরুত্ব তৎকালীন সময় তো বটেই, বর্তমান সময়তেও অপরিহার্য। ১৮১৯ সালের ২৪ শে এপ্রিল 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় 'চড়কের মেলা' নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং সেখানে বলা হয়- 'উৎসবে ছ্যাকরা গাড়ি ভর্তি হয়ে বাইজিরাও এসেছিল অনেক। যেমন তাদের পোশাক, তেমনি নাচ-গানের ভঙ্গি, যাঁর রুচি আছে তাঁর পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন। কিন্তু এই বাইজি নাচ দেখার জন্য বহু হিন্দু ভদ্রলোকের ভিড় হয়েছিল উৎসবে। এক - একটি চড়কতলার মেলায় ত্রিশ হাজারের মত ভিড় হত'।[১৫] সমাচার দর্পণে গাজনের মেলা সম্পর্কে বিবৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, গাজনের মেলা বহু মানুষের একটি মিলন ক্ষেত্র রূপে প্রতিভাত হয়। এই মেলার মধ্যে দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজকে আমরা দেখতে পাই। একটা সমাজের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়। আবার অবশ্যম্ভাবী ভাবে এটাও বলা যায় যে, যে কোন মেলার একটা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকে, মেলা পণ্য বিপনন–উপভোগ পদ্ধতির একটি বৃহৎ ক্ষেত্র ও চালিকা শক্তি। সেই সূত্রে গাজনের মেলাও শুধুমাত্র কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উৎসব ক্ষেত্র নয়, এটি গ্রামের মানুষদের কাছে কৃষিজাত পণ্য বিপননের একটি স্বয়ংক্রিয় মাধ্যম। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই মেলাগুলো গ্রামের মহিলাদের নিত্য–নৈমিত্তিক জীবনধারার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান বিশ্বায়নের যুগেও অর্থনৈতিক–সামাজিক কলাকৌশলের মাধ্যম রূপে গাজনের মেলার গুরুত্ব অপরিসীম।[১৬]

গাজন উৎসবটির সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানুষের জীবনচর্যার মধ্যে থেকে উত্থিত লোক সঙ্গীতের সুর বাংলার সংস্কৃতির এক অমলিন ঐতিহ্য। লোকসঙ্গীত বাংলার সাংস্কৃতিক পরম্পরার এক প্রবহমান আঙ্গিক, যা বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ লোকসমাজের প্রতিচ্ছবি। প্রাসঙ্গিকক্রমে বলা যায় যে, অষ্টাদশ–ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় আলোকপ্রাপ্তির মননশীলতা ও বিত্তশালী 'বাবু' সংস্কৃতির সমান্তরালভাবে জেলে, নাপিত, জোলা, ময়রা, কুলি, মজুর প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল এবং তার অন্যতম অভিব্যক্তি ছিল সঙের ছড়া বা গান। তৎকালীন সময়ের নাগরিক বুদ্ধিজীবীগণ সঙের গান রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। রসরাজ অমৃতলাল বসু, দাদাঠাকুর প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙের গান সমাজ–সমালোচকের ভূমিকা পালন করত। কালের বিবর্তনে সঙের গান অবশ্য পূর্বের জৌলুস হারালেও, নানান উত্থান – পতনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে জেলে পাড়ার সঙ আজও আত্মপ্রকাশ করে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, গাজন পালা কিংবা গাজন গানের মধ্যে দিয়ে নিম্ন বর্গীয় মানুষদের প্রতিবাদ অতি সূক্ষ্যভাবে, হাল্কা চালে ও মজার মাধ্যমে আপামর জনগণের কাছে পৌঁছায়। গাজনের লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্য – এ সবের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের সাথে সাথে সকলের সাথে এক আদান – প্রদানের সামাজিক মেলবন্ধনের তাৎপর্যও পরিলক্ষিত হয়।

গাজন উৎসবে জড়িত আদিবাসী জনগোষ্ঠী তথা অন্ত্যজ মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের প্রাসঙ্গিকতার সাথেই গাজন উৎসবটির বর্তমান প্রাসঙ্গিকতাও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। গাজনের সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যারা সাধারণতঃ অবসর সময়ে ক্ষেত মজুর, মাছ ধরা, নানা দ্রব্য–সামগ্রী ফেরী করা, উৎসব-অনুষ্ঠানে বাজনদার হয়ে কোনো রকমে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটায়। এদের সামগ্রিক করুণ এবং নৈরাশ্যজনক অবস্থা থেকে মুক্তি না ঘটলে গাজনের মত একটি পরম্পরাগত উৎসব সম্ভবতঃ ক্রমান্বয়ে কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় এ বিষয়ে অবগত হওয়া গেছে যে, গাজন উৎসব পৃষ্টপোষকতা ছাড়া চলতে পারবে না। পূর্বে এই উৎসবটি জমিদারী পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ থাকলেও,

বর্তমান সময়ে কিছু সংগঠন এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু এটাও সত্য যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সদিচ্ছায় বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে কিছুটা আর্থিক সহায়তা হলেও তা চাহিদার তুলনায় নিতান্তই কম। গাজনের এই সব সন্ন্যাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত উন্নয়ন না করলে কোনোভাবে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে হয়তো, কিন্তু দিন দিন তার জৌলুস হারিয়ে যাবে। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের পরিমণ্ডলে আদৌ লোকনাট্য, লোকগীতি, লোকনৃত্য চিরতরের জন্য হারিয়ে যাবে কিনা সেটা বর্তমান নাগরিক সমাজকে যেমন ভাবায়, তেমন এটাও সত্য যে লোকনাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের নিরবচ্ছিন্ন প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। গ্রামীণ বিবর্তনের আধুনিক পরিকাঠামোর মধ্যেও লোকসংস্কৃতির এই সব শাখা-প্রশাখা কষ্টসাধ্য উপায়ে তাদের প্রবহমানতাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস চালাচ্ছে। লোকসংস্কৃতির সামাজিক বিবর্তন আধুনিকতার মোড়কে গেলেও, তার মৌলিক পরিকাঠামো বা সামগ্রিক পরিমণ্ডল কখনোই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে না।[১৭]

যান্ত্রিক পরিবহণের যুগে মানুষের সামাজিক সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতির আদি – অকৃত্রিম রূপটি আজও দীর্ঘস্থায়ী আছে। নাগরিক সংস্কৃতির ছায়া গ্রাম্য সংস্কৃতির ধারাটিকে সেভাবে কলুষিত করতে পারেনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্বয়ং লোকসংস্কৃতির প্রবাহে গ্রামীণ জনসংস্কৃতির উৎস বা প্রবাহটিকে জীবন্ত রূপে দেখেছিলেন।[১৮] গাজন উৎসবটিও বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আজও সজীবতায় পূর্ণ। নাগরিক কোলাহলমুখর সংস্কৃতির সহাবস্থান রূপে গ্রাম্য সমাজের চিত্ত বিনোদন এবং পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের এক মেলবন্ধনের রূপে গাজনের মাহাত্ম্য অপরিসীম। লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক-বাহক রূপে প্রতিভাত গাজনের ধর্মীয় মহিমা যেমন সাধারণ নিম্নবর্গীয় মানুষদের কাছে বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক, তেমনি এর সামাজিক- অর্থনৈতিক এবং অবশ্যই সাংস্কৃতিক মাহাত্ম্যকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। লোকসমাজের অস্তিত্ব থাকলে লোকসংস্কৃতির অস্তিত্ব থাকতে বাধ্য। তবে কালের বিবর্তনের পরিমণ্ডলে লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা হিসাবে পরিচিত গাজনের কিছু কিছু লোকাচারের ক্রম বিলুপ্তি ঘটেছে।

গাজন উৎসবের অন্যতম প্রাণভোমরা সুন্দরবনের 'বালাকি-বালাগান' সেই কারনেই কি আজ ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে? সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। বিশেষভাবে বলা যায় যে, ২০০৯ সালের আয়লা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর স্থানীয় মানুষদের আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনে রুটি – রোজগারের তাগিদে এলাকাবাসী বর্তমান সময়ে পরিযায়ী শ্রমিক রূপে দেশের অন্যত্র কর্মরত। প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ 'বালাগান' শিল্পীরা বয়সের ভারে কর্ম ক্ষমতা হারিয়েছে এবং নতুন প্রজন্মের ছেলেরা এই মৌখিক ঐতিহ্যশালী গান শিখতে আগ্রহী নয়। উগ্র আধুনিকতার আঁচে পরে বালাগানের নিজস্ব সুর হারিয়ে যাচ্ছে, প্রাচীন এই ঐতিহ্যটির মৌলিকতা আজ বিষম বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, লক্ষ্মীকান্তপুর এলাকায় বালাগান প্রচলিত নেই, এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে গাজনের শিল্পীরা পৌরাণিক বিষয় বাদ দিয়ে মনোরঞ্জনের কথা মাথায় রেখে অসংগতিপূর্ণ হাস্যকর ভাঁড়ামিকে আশ্রয় করে গান লিখে যা পরিবেশন করে তাতে প্রতিযোগিতায় বালাগানের শিল্পীরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। তাছাড়া কেবলমাত্র ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে প্রচার বিমুখ হয়ে বাস্তবে কোন লাভ নেই। এই বালাগান বালাকি দেউল উৎসবের প্রচারে মিডিয়া কিংবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। তাই বাণিজ্যিক ভাবে বালাগান উপস্থাপনের বিমুখতা এর জনপ্রিয়তাকে ক্রমান্বয়ে শেষ করে দিচ্ছে। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে দেউল পূজা, বালাকি বালাগান সুষ্ঠুভাবে পালন করাও ব্যয়সাপেক্ষ। গোসাবা ব্লকের কচুখালি, মোল্লাখালি, সাতজেলিয়ার বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ দেউল পূজা ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং চৈত্র ও বৈশাখ মাসের প্রখর দাবদাহে সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে ঢাক, ঢোল, কাঁসির বাজনায় মুখরিত ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীদের করুণ স্বর 'বাবা ত্রিশূলধারীর চরণে সেবা লাগে – বাবা মহাদেব' আর ধ্বনিত হবে না। লৌকিক এই ঐতিহ্যপূর্ণ বালাগান বালাকিকে টিকিয়ে রাখতে গেলে সরকারি-বেসরকারি দুই উদ্যোগের প্রয়োজন আছে।[১৯]

গাজন উৎসবটির মধ্যে কৃচ্ছসাধন পালনের কঠোরতার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কিংবা যৌক্তিকতা আজ আর নেই। চড়ক অনুষ্ঠান নানা কারণে কিছু স্থানে বন্ধ হয়ে গেছে, তবে গ্রামীণ মানুষদের কাছে এই অনুষ্ঠান পালন ধর্মীয় বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ। কৃচ্ছসাধন পালনের নিয়মানুবর্তিতা তাদের কাছে আবেগের এক বিশ্বাসজাত প্রক্রিয়া এবং যা থেকে তারা কখনোই সরে আসার চিন্তা-ভাবনা করেনি। এই উৎসব সেই সব গ্রামীণ অন্ত্যজ মানুষদের কাছে সার্বিকভাবে ভালো থাকার

প্রাণকেন্দ্র। এটি তাদের কাছে মাটির জন্য, জীবিকার জন্য, নির্ভরতার জন্য, সুস্থ থাকার জন্য মূল চাবিকাঠি। তাই এক্ষেত্রে কোন আধুনিকতার স্পর্শ তাদের গায়ে লাগেনি।[২০] যদিও একসময় গাজন উৎসবে পালিত বিভিন্ন কৃচ্ছসাধন তথা কষ্ট সাধ্য প্রক্রিয়া ব্রিটিশ সরকারের কাছে অমানবিক মনে হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ১৮৬৫ সাল নাগাদ ছোটলাট বিডন গাজনের ফোঁড়াফুঁড়ি – কাটাকাটি বন্ধ করতে আইন প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি ইস্তাহার জারি করে রীতিমত চড়কের ভয়াবহ উদযাপনকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই 'বাণফোঁড়া', 'কাঁটাঝাঁপ' বন্ধ হয়ে যায়। তবে বর্তমান সময়তেও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় কৃচ্ছসাধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রবর্তিত আছে। কিন্তু তার ভয়াবহতা অবশ্যই কিছুটা কম। ১৮৬৩ সালেও ব্রিটিশ সরকার আইন করে শরীরে বাণ-বঁড়শি বেঁধানো নিষিদ্ধ করলেও, গ্রামীণ জীবনে এই আইনের খুব একটা প্রভাব পড়েনি। কৃচ্ছসাধনের আচার – অনুষ্ঠান বেশ কিছু স্থানে এখনও টিকে আছে। প্রাসঙ্গিকক্রমে, কলকাতার অনাথবাবুর বাজারে অনুষ্ঠিত গাজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২১]

গাজন উৎসবটির মধ্যে দিয়ে মানুষের সামাজিক আদান-প্রদানের পাশাপাশি মানসিক ভাব বিনিময় কিংবা আর্থিক লেনদেনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এই উৎসবটির একটি সৃজনশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে, যার প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান বিশ্বায়নের পরিমণ্ডলেও এক ও অদ্বিতীয়। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম, সাহিত্য, কলাবিদ্যা প্রভৃতির এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। লোকনাট্য, লোকনৃত্য, লোকগানের মৌলিক ধারাকে অটুট রাখার প্রয়াস গাজনের মত লোকসংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে হলেও, নগরায়ণের ধাক্কা সামলানো খুব কষ্টকর। কারণ এটা বর্তমান সময়ে প্রতীয়মান যে, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে পরিবর্তন করে বাণিজ্যিক উপাদানে পরিণত করার তাগিদে সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশন সর্বদাই উদগ্রীব হয়ে আছে। 'কালচারাল কন টিন্যুয়াম' পারস্পরিক আদান-প্রদানকে সূচীত করে ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেই অজুহাতে সংস্কৃতির একটি স্তরের শিল্প-প্রকরণ বিলুপ্তির পথে চলে যাবে। প্রত্যেকটি স্তরের নিজস্ব সত্ত্বাটা যাতে বজায় থাকে, সেই বিষয়টি দেখাও একান্তভাবে কাম্য।[২২] তাই গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে যে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারা আজও বহমান, সেই ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে তবেই গাজনের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলো বাঁচবে, বাঁচবে বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ চিরন্তন একটি লোকসংস্কৃতি।

পথের পাঁচালীর যে পরিচ্ছেদে অপু – দুর্গা দুজনেই চড়কে মেতেছে, তার শিরোনাম হল 'হলুদ বনে বনে'। শেষে অপু জঙ্গলের মধ্যে গন্ধ ভেদালির পাতা খুঁজতে খুঁজতে অকারণেই আবৃত্তি করেছে এই মিঠে ছড়াটি – 'হলুদ বনে বনে -/ নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে'। এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, বর্ষশেষ এবং নববর্ষের সন্ধিক্ষণের মতোই গাজন- চড়ক যেন অতীত আর বর্তমানের একটি যোগসূত্র। কিছু হারিয়ে যায়, আর কিছু থেকে যায়।[২৩] অন্ত্যজ মানুষদের সমাবেশে পরিপূর্ণ ঊর্বরতাকেন্দ্রিক গাজন উৎসবটির প্রাসঙ্গিকতা তাই বর্তমান বিশ্বায়নের ধাক্কায় যথেষ্ট সমাদৃত হয়। এই উৎসবটিকে কেন্দ্র করেই পরিবেশ, চাষাবাদ, শিল্প-সংস্কৃতি, মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস – এ সব কিছুই যেন একে অপরের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে আছে। বর্তমানের আধুনিক সভ্যতা ও বিশ্বায়নের প্রভাবে গাজনের গান, ছড়া, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব হারাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা এই উৎসবকে নিজেদের সংস্কৃতি প্রকাশের মূল মঞ্চ বলে মনে করে থাকে। এই উৎসবটি কেবলমাত্র গ্রামীণ মানুষদের কাছে একটি বাৎসরিক দেব- দেবীর পূজার অনুষ্ঠান নয়, এর সাংস্কৃতিক, আচারমূলক দিকগুলির অবদান অপরিসীম। এটি গ্রামের মানুষদের কাছে তাদের সার্বজনীন কুশলতার প্রতীক এবং অবশ্যই সকলের সুখ-সমৃদ্ধির, ভালো থাকার, মঙ্গল কামনার এক অদ্বিতীয় প্রাণবন্ত উৎসবরূপেই সমাদৃত হয়ে আসছে।[২৪] আর এই সূত্রধরেই বলা যায় যে, গাজনের প্রাসঙ্গিকতা আছে, থাকবে এবং বর্তমান নগরায়ণের যুগে যে প্রাণবন্ততা, সজীবতা, যা মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত তার পরিপ্রেক্ষিতে গাজনের মত একটি লোকউৎসবের সার্থকতা আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, (১৯৬২, ১ম খণ্ড), বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃ. ১৯৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 466 - 473
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. বর্ধন, মণি, (২০০৪), বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ২৩ - ২৪
৩. অধিকারী, ডঃ মনোজিৎ, (২০১৬, সেপ্টেম্বর), গাজন, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৩৭
৪. তদেব, পৃ. ১৪৩
৫. তদেব, পৃ. ১৪৪
৬. তদেব, পৃ. ১৪৪ - ১৫৪
৭. মণ্ডল, নিরঞ্জন, (২০২২, জুলাই), সুন্দরবনের শিবের গাজন বালাকি বালাই- শ্লোক বালাগান, গাঙচিল, পৃ. ৫২ - ৫৪
৮. অধিকারী, ডঃ মনোজিৎ, (২০১৬, সেপ্টেম্বর), গাজন, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৫৫ - ১৫৮
৯. তদেব, পৃ. ১৬২ – ১৭২
১০. Dutt, Gurusaday, (1941), The Folk Dances of Bengal, published by Birendra Saday Dutt on behalf of the Estate of Late Sri Gurusaday Dutt, I.C.S (Retd.), p. 82
১১. অধিকারী, ডঃ মনোজিৎ, (২০১৬, সেপ্টেম্বর), গাজন, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২০০
১২. তদেব, পৃ. ২০৩ – ২০৫
১৩. ইসলাম, সিরাজুল, (২০০৩, মার্চ, চৈত্র, ১৪০৯), (সম্পা.), বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ১৫৩ - ১৫৪
১৪. বসু, কাঞ্চন, (১৯৯১, জুলাই, ১, ১ম খণ্ড), (সম্পা.), চিরায়ত সাহিত্য সংগ্রহ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, পৃ. ৯ - ১২
১৫. সেনগুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ, (২০২৪, এপ্রিল, ৭), চড়ক, দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকা 'রবিবারের বৈঠক' বিভাগ, পৃ. ৫
১৬. অধিকারী, ডঃ মনোজিৎ, (২০১৬, সেপ্টেম্বর), গাজন, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২০৩ - ২০৪
১৭. তদেব, পৃ. ২০৬ – ২১০
১৮. ঘোষ, বিনয়, (১৩৮৬, আশ্বিন), বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, অরুণা প্রকাশনী, পৃ. ২
১৯. মণ্ডল, নিরঞ্জন, (২০২২, জুলাই), সুন্দরবনের শিবের গাজন বালাকি বালাই- শ্লোক বালাগান, গাঙচিল, পৃ. ১৩৪
২০. অধিকারী, ডঃ মনোজিৎ, (২০১৬, সেপ্টেম্বর), গাজন, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২১১ - ২১২
২১. সেনগুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ, (২০২৪, এপ্রিল, ৭), চড়ক, দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকা 'রবিবারের বৈঠক' বিভাগ, পৃ. ৫
২২. সেনগুপ্ত, পল্লব, (১৯৫৯, ডিসেম্বর), লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, পৃ. ২১৯
২৩. সেনগুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ, (২০২৪, এপ্রিল, ৭), চড়ক, দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকা 'রবিবারের বৈঠক' বিভাগ, পৃ. ৫
২৪. অধিকারী, ডঃ মনোজিৎ, (২০১৬, সেপ্টেম্বর), গাজন, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২২৩ - ২২৪